প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

২০০৪-০৫ অর্থবছরে ভয়াবহ বন্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, তৈরি পোষাক শিল্পে কোটা প্রথার অবসান এবং জ্বালানি তেলসহ আমদানিকৃত প্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতির সামনে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। এর পাশাপাশি বিশ্ব-অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির প্রবণতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হওয়ার আশঙ্কা এ চ্যালেঞ্জকে আরও ঘনীভূত করে। সরকার দৃঢ়তার সাথে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় অর্জিত ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে অন্যান্যের মধ্যে সরকার চলতি অর্থবছরের শেষ দিকে প্রলয়ঙ্করী বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি গতিশীল রাখার জন্য কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME), রপ্তানি ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে পর্যাপ্ত ঋণ যোগান নিশ্চিত রাখার পাশাপাশি অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান নিরুৎসাহিত করে। বন্যা পরবর্তীকালে অবকাঠামো পুনর্বাসন এবং সার ও বীজে ভতুর্কি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ

বন্যা ও অতিবর্ষণের কারণে কৃষিখাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও শিল্প ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির কারণে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো স্থূল দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) ৫.৩৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে বলে প্রাক্কলন করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে যেত। লক্ষ্যণীয় যে, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উচ্চতর প্রবৃদ্ধির কারণে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলিত সীমা (৫.৫২ শতাংশ) ছাড়িয়ে ৬.২৭ শতাংশে উন্নীত হয়- যা এযাবতকালে অর্জিত প্রবৃদ্ধির মধ্যে সর্বোচ্চ। মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয় যথাক্রমে ৪৪৫ ও ৪৭০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় চলতি অর্থবছরে জাতীয় বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৪৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে যা এযাবতকালের সর্বোচ্চ। এ বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অবদান ১৮.৫৩ শতাংশ। সরকার কর্তৃক অনুসৃত বাস্তবমুখী নীতির কারণেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

চলতি অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধিসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্যস্ফীতির হারে কিছুটা উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হলেও অক্টোবর ২০০৪-এর ৭.৯২ শতাংশের তুলনায় মার্চ, ২০০৫ এ তা ৬.৭১ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ অর্থবছরের মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ৯ মাসের গড় মূল্যস্ফীতির হার ৬.৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সরকার কর্তৃক শুল্ক হার পুনঃনির্ধারণের মত অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে সংযত রাজস্বনীতি ও সতর্ক মুদ্রানীতি অবলম্বন করায় মূল্যস্ফীতি সহনশীল পর্যায়ে সীমিত রাখা সম্ভব হবে।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব খাতে বাজেট ঘাটতি পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের ন্যায় সহনীয় থাকবে। এ ঘাটতির অধিকাংশ সহজ শর্তে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা অর্থায়িত হবে। অবশিষ্ট ঘাটতির অর্থায়ন হবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংগৃহীত ঋণ দ্বারা। ঘাটতি অর্থায়নে সরকারের এই বিচক্ষণ পদক্ষেপ বেসরকারি খাতকে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে। ফলে অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে জোরালো হয়ে উঠছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার ১২.৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তীবছরে একই সময়ে ছিল ৭.৬ শতাংশ। রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়ের মূল লক্ষ্যমাত্রা ৩৩৬৪০ কোটি টাকার বিপরীতে

এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে ২৩০৪৮ কোটি টাকা-যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, মোট রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ছিল ১০.৬ শতাংশ, যা চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ১১.২ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। সরকারি ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫০ শতাংশ । ২০০৪-০৫ অর্থবছরে মূল বাজেট অনুযায়ী সরকারি ব্যয়-জিডিপি অনুপাত ১৫.৫ শতাংশে প্রাক্কলন করা হয়েছে - যা সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০০৩-০৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছিল ১৪.৮ শতাংশে।

বৈদেশিক খাত

চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই ২০০৪-মার্চ ২০০৫) রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০৯৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মোট রপ্তানিতে এখনও তৈরি পোষাক ও নীটওয়্যার-এর অবদানই বেশি। এ অর্থবছরে প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী আমদানি ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৮২৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মোট আমদানি ব্যয়ে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি ব্যয়ই সর্বাধিক। রেমিট্যান্স প্রবাহে চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরেও প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে। এ বছরের প্রথম ১০ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ দাঁড়ায় ৩১৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১৫ শতাংশ। বাস্তবমুখী রপ্তানি নীতি বাস্তবায়নের ফলে রপ্তানি আয় এবং নানাবিধ প্রনোদনমূলক কর্মসূচি প্রবর্তনের কারণে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক রিজার্ভের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে- যা এবছরের ১৮ মে ২০০৫ পর্যন্ত ২৯৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেও সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। এ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ পর্যন্ত সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৩২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির অব্যাহত ধারা বজায় থাকলে সার্বিক ভারসাম্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে।

মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

পূর্ববর্তী বছরগুলোর সংকুলানমুখী (accommodative) মুদ্রানীতির কারণে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ যোগান ও আমদানি চাহিদা বেড়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতির হার সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য এ অর্থবছরের মাঝামাঝি সময় থেকে মুদ্রানীতিতে সতর্ক পন্থা অবলম্বন করা হয়। এ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ব্যাপক মুদ্রার (M_2) যোগান ৮.৮ শতাংশে বেড়ে যায় যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে এ বৃদ্ধি ছিল ৭.৩ শতাংশ। অপর পক্ষে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত) সরকারি খাতে নীট ঋণের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১.৭ শতাংশ। পক্ষান্তরে, উক্ত সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ১২.৬ শতাংশ। সুদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে সরকার কৃষি, শিল্প, ও বাণিজ্য খাতে ঋণ সঞ্চালন বৃদ্ধি করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই - এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত) কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৪২০০ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের বিতরণের চেয়ে প্রায় ৪৭ শতাংশ বেশি। একই সময়ে শিল্প খাতেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ৪৩ শতাংশ বেশি ঋণ সঞ্চালিত হয়েছে। পুঁজিবাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মার্কেট ক্যাপিটাইলাইজেশনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩৫২৭ কোটি টাকায় যা জুন ২০০৪ শেষে ২২৪৯২ কোটি টাকার তুলনায় ৪.৬ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে একই সময়ে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মার্কেট ক্যাপিটাইলাইজেশন বৃদ্ধি পায় ১.৩ শতাংশ । ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ -এ শেয়ারের সর্বশেষ মূল্য সূচক (মার্চ ২০০৫ -এ) দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৯১৯.৩ ও ৩৬১৯.৯ -এ, যা জুন ২০০৪ শেষে ছিল যথাক্রমে ১৯৭১.৩ ও ৩৫৯৭.৭ -এ।

সংস্কার কার্যক্রম পর্যালোচনা

পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়ন

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Millennium Development Goals (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য)-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার ব্যাপক আলোচনা ও মত বিনিময়ের পর চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি মাসে তিন বছর মেয়াদি পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; উন্নয়ন সহায়ক গ্রামীণ কৃষি ও কৃষিখাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত, পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং যোগাযোগ খাতসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান; লক্ষ্যভিত্তিক দারিদ্র হ্রাস কর্মসূচি ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মানব-দারিদ্র নিরসনের জন্য শিল্প, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিখাতে ক্রমান্বয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি -এই চারটি কৌশলগত নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সরকার এই জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

রাজস্ব খাত সংস্কার

অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ

অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করে কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার কর ব্যবস্থা আরও আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজস্ব বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতার মানোন্নয়নসহ রাজস্ব ফাঁকি রোধ এবং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাস্টমস, মূসক এবং আয়কর প্রশাসন আধুনিকীকরণের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল প্রকার রাজস্ব leakage হ্রাস করার জন্য বৃহৎ করদাতা ইউনিটসহ একটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (Central Intelligence Cell) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কর ফাঁকি রোধ করার জন্য সরকার কর্তৃক একাধিক অডিট ফার্ম নিয়োগসহ অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর-বহির্ভূত রাজস্বের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা

সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশনের সুপরিশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও অংশীদারিত্বমূলক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচিত কতিপয় মন্ত্রণালয়ে বাজেট বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে সম্ভাব্য সম্পদ সীমার (indicative resource ceiling)- এর মধ্যে বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং অধীনস্থ দপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের জন্য সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়েল চূড়ান্ত করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ এবং ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অর্থ বিভাগে সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়ায় একটি পৃথক সম্পদ ও ঋণ অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাজেটকে দারিদ্র নিরসন সহায়ক এবং জেন্ডার-বৈষম্য দূরীকরণ সহায়ক করার উদ্দেশ্যে নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আর্থিক খাত সংস্কার

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনগত সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় সংস্কার চলমান রয়েছে । এর ফলে ব্যাংকের কর্মপ্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগসহ ব্যাংকের তদারকি সামর্থ্য বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার সামর্থ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ব্যাংকসমূহের সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (এনসিবিসমূহ) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঋণ যোগানের স্ফীতি পরিমিত রাখার জন্য অন্যান্যের মধ্যে চলতি অর্থবছরের মার্চ ২০০৫ থেকে

এনসিবিসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে অবশ্য রক্ষণীয় নগদ জমার মাত্রা (Cash Resrve Requirement-CRR) শতকরা ৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে ৪.৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ-শৃংখলা জোরদার করার জন্য যে সব ঋণ ৯০ দিন বা এর অধিক সময় মেয়াদোত্তীর্ণ থাকবে তা Special Mention Account- এ স্থানান্তর করা হবে এবং উক্ত ঋণের উপর অনাদায়ী সুদ আয় হিসাবের (Income Account) -এর পরিবর্তে স্থগিত সুদ আয় (Interest Suspense Account) হিসাবে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হযেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অনিয়ম সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ সেল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবীদের জন্য ''পেনশনার সঞ্চয় স্কীম'' প্রবর্তন করা হয়েছে। কলমানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক কলমানি মার্কেট থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ তাঁদের মোট নীট সম্পদের (net assets) সর্বোচ্চ শতকরা ১৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়েছে - যা ১ জুলাই ২০০৫ থেকে কার্যকর হবে।

পুঁজিবাজার

চলতি অর্থবছরে পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অন্যান্যের মধ্যে স্টক-ব্রোকারদের ক্রেডিট সুবিধা প্রদান স্থগিত, স্টক এক্সচেঞ্জ ট্রেড মার্জিন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত, আইপিও ফ্লোটেশন কস্ট (IPO Floatation Cost) হ্রাস, বেনিফিসিয়ারিজ ওনার্স (Beneficiaries Owners) একাউন্ট বাধ্যতামূলককরণ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য খাত সংস্কার

দেশের অর্থনীতির উপর কোটা প্রথা বিলুপ্তির নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনের জন্য সরকার ''পোষ্ট এমএফএ অ্যাকশন প্রোগ্রাম'' শীর্ষক একটি কৌশলগত কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। আরএমজি সেক্টরে উদ্ভূত সমস্যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরসনের উদ্দেশ্যে একটি ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আযোজন করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিন বছর মেয়াদি আমদানি ও রপ্তানি নীতি (২০০৩-০৬) ঘোষণা করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে The EPZ Workers Association and Industrial Relations Act 2004 জারি করা হয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ই-গভর্ন্যান্স এবং BOI Online Service Tracking System (BOST) প্রবর্তন করা হয়েছে।

কৃষি

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য নিরসন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও টেকসই উন্নয়নে কৃষি খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে স্থূল দেশজ উৎপাদ বা জিডিপিতে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের (ফসল, পশুসম্পদ, বন ও মৎস¨) সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ২১.৯১ ভাগ। এতে মৎস্য খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৫.০৩ ভাগ। এককভাবে ফসল উপখাতের অবদান জিডিপি'র শতকরা প্রায় ১২.১০ ভাগ। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৫১.৭ ভাগ কৃষিখাতে নিয়োজিত (বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০০২-২০০৩)। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে চূড়ান্ত হিসাব মোতাবেক খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ২৭৪.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ১৮.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১১৫.২১ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১২৮.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১২.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩০০.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আউশ ২০.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১২৭.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৩৭.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ও গম ১৪.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন।

দেশে বর্তমানে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং সেই সাথে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে টেকসই প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কৃষি ব্যবস্হার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় সারসহ কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ, কৃষি সম্প্রসারণ নীতির বাস্তবায়ন, কৃষিঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজিকরণ, কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, কৃষিজাত পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা পদ্ধতির আধুনিকায়ন, গবেষণালব্ধ সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহার ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় কৃষিনীতিসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয়েছে। সম্প্রসারণ সেবাকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, কৃষি পণ্য ব্যবসাকে শক্তিশালী, জনপ্রিয় ও লাভজনক করার কাজে বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণ, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগী কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ এর অন্যতম উদ্দেশ্য । জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্হাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্হা নেয়া হয়েছে এবং সে সাথে গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হচেছ । এ ছাড়া মৃত্তিকা সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধ, সেচের পানির উপযোগিতা নির্ণয়, ভূমির অপব্যবহার ও ফসলের পুষ্টি ঘাটতি রোধকল্পে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

২০০৪-০৫ বছরের সংশোধিত বাজেটে ইউরিয়াসহ টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সার ও বিদ্যুৎ এর উপর ভর্তুকি এবং কৃষিখাতে সহায়তার জন্য ১৩১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ বিকল্প সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সরকার কর্তৃক গত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করা হয়েছে, যা কৃষকদের ঋণ ভার লাঘব করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। শুধুমাত্র আসল টাকা কিস্তিতে ফেরত প্রদানের মেয়াদ পূর্ব নির্ধারিত ৩০ মার্চ ২০০৫ থেকে ৩০ মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে। বর্তমান ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৫৫৩৭.৯১ কোটি টাকা এবং এপ্রিল'০৫ পর্যন্ত ৪২০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৫৪,১৪১ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২৩৬৩.৪৭ কোটি টাকা আয় হয়েছে। ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী সরকারি পর্যায়ে ১১২টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৬৯৬টিসহ সর্বমোট ৮০৮টি মৎস্য হ্যাচারি ও খামার রয়েছে। বেসরকারি খামার ও হ্যাচারি হতে ২০০৩ সালে ৫১৭ কোটি পোনা (২৯৭.৭৮ মেঃ টন রেণু) উৎপাদিত হয়েছে । সরকার পশু সম্পদ উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে ব্যাপক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন করা হয়েছে। ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন- জাতীয় কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর বাণিজিক খামার স্থাপন এ খাতে যেমন ব্যাপক অবদান রেখেছে তেমনি বেকার যুবকদের আত্ম কর্ম সংস্থান ও বিরাট অঙ্কের বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে পশুসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫৯.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমান্বয়ে এখাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছররে ১৪.৯২ শতাংশ এর তুলনায় চলতি অর্থবছরে প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৬.৫৮% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৮.৪৩ শতাংশ। যা গত অর্থবছরের চেয়ে ০.৪২ শতাংশ বেশি এবং প্রবৃদ্ধির হার ১.৩৩ শতাংশ বেশি। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধির এ প্রবণতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে বেগবান করেছে। এ প্রবৃদ্ধি অর্জনের চালিকা শক্তি হচ্ছে তৈরি পোষাক ও নীটওয়ার শিল্প। মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সরকার বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি খাতের শিল্প-কারখানাকে পর্যায়ক্রমে বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতি অনুসরণ করছে। এবছরে ৫টিসহ এযাবৎ ৬০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্পের জনবলকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করে যথাযথভাবে পুনর্বাসনের কর্মসূচি সরকার গ্রহণ করেছে।

বেসরকারি বিনিয়োগে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহব্যাঞ্জক নীতিমালা সরকার ঘোষণা করেছে। দেশে সুষ্ঠু শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (এসএমই) অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সরকার চিহ্নিত করেছে। দেশব্যাপী এসএমই শিল্প প্রতিষ্ঠায় ও কৌশলগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার একটি পৃথক এসএমই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান শিল্পনীতিতে অধিকহারে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সুষ্ঠু শিল্পায়নে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের অংশ গ্রহণের বিষয়টিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এসএমই খাতের দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবি'র সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকার এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন খাতে মোট প্রায় ১২৩.৭২ কোটি টাকা অর্থায়ন করেছে। এ টাকা ৭টি ব্যাংক ও ৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোট ২১৯২টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে ঋণ সহায়তা হিসেবে বিতরণ করেছে। ফলে এখাতে শীঘ্রই আরও দ্রুত প্রবৃদ্ধি আশা করা হচ্ছে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত এসকল পদক্ষেপের ফলে দেশে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বহু দেশি বিনিয়োগকারীসহ অনেক বিদেশি বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ ও শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ডে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন ২১% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে নিবন্ধিত মোট ১০৬৯টি স্থানীয় প্রকল্পে ১৫৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে। অধিকন্তু দেশের ৬টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে এপ্রিল'০৫ পর্যন্ত মোট ২১০টি শিল্প চালু ছিল যার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৭৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া বিভিন্ন ইপিজেডে আরও ১০৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বিগত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ইপিজেড শিল্প কারখানা হতে ১৩৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। যা জাতীয় রপ্তানির প্রায় ১৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। শিল্পখাত উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী এক দশকের মধ্যে দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) শিল্প খাতের অবদান ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশে এবং এখাতে নিয়োজিত মোট জনশক্তির হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শিল্পখাতে প্রাক্কলিত এ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিল্প নীতিতে কৃষিভিত্তিক ও কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা জোরদার, রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্পের প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, এসএমই ও কুটির শিল্প খাতকে শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ জোন প্রতিষ্ঠা, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিল্প নীতিতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ফলে পরিকল্পিতভাবে দেশে শিল্পোন্নয়নের বিস্তৃতি ঘটবে এবং শিল্প খাতে অব্যাহত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। যার ফলশ্রুতিতে দেশে দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি প্রবর্তিত হওয়ায় এসব সংস্থার সার্বিক লোকসানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং জাতীয় উৎপাদন, মুল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে এসব সংস্থার অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এসব সংস্থার পরিচালন রাজস্ব ও মূল্য সংযোজনে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এসব সংস্থার পরিচালন রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল ৮.২৫ শতাংশ এবং মূল্য সংযোজনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২০.৫৬ শতাংশ। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ সংস্থাসমূহ লভ্যাংশ হিসেবে ২০২.৩১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে এবং চলতি অর্থবছরে (২০০৪-০৫)-এর পরিমাণ ২৮১.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ১৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার মোট দেনার পরিমাণ ১৪৮৫.৭১ কোটি টাকা এবং ১৫মে ২০০৫ পর্যন্ত ৭৭৮.২৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট এই ৪৪টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ৮৭৩৯.১৮ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার ঋণতাত্মক হলেও তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুৎঃ- বিদ্যুৎ শক্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। দেশের শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা এবং কৃষি ও সেবা খাতে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। একটি বিদ্যুতায়িত গ্রামের বিদ্যুতায়িত গৃহের আর্থিক আয় ৯২৯৬৩/- যা একটি অবিদ্যুতায়িত ঘরের তুলনায় শতকরা ৬৫ ভাগ বেশী। তাই সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের সংগে বেসরকারি খাতকেও সরকারি খাতের পাশাপাশি সম্পৃক্ত করেছে। যাতে সরকারের বিঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়। বিগত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৭১০ মেগাওয়াট। তম্মধ্যে সরকারি খাতে ৭২.৬১ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ২৭.২৯ শতাংশ উৎপাদন ছিল । বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সর্বাধিক এবং প্রতি বছরেই এর ব্যবহার বাড়ছে। বিগত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে নিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৮৮.৯০ শতাংশ গ্যাস, ৭.১১ শতাংশ তেল এবং ৩.৯৯ শতাংশ পানি ভিত্তিক ছিল। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত ৩৬৫২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন পূর্বের ১৪৪ কিলোওয়াট আওয়ার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৫ কিলোওয়াটে দাঁড়িয়েছে। দেশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি নামক সংস্থা সমূহ দেশে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করলেও বর্তমানে বিউবো এর মালিকানাধীন ''পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)'' বিদ্যুৎ সঞ্চালন, ব্যবহার, পরিচালন ও সংরক্ষণসহ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের পূর্ণ দায়িত্ব অর্থাৎ সংস্থাটিকে দেশের একমাত্র ট্রান্সমিশন নেট ওয়ার্ক পরিচালনাকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। বিউবো'র সিষ্টেমে দেশে ৩৩ কিলোভোল্ট ও ১১ কিলোভোল্ট বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয় । ১৯৯১-৯২ অর্থসালের মোট ৩২৭৮০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ২০০৩-০৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪২৩৩২ কিলোমিটার হয়েছে। এ ছাড়া গ্রাহক সংখ্যাও ৯,০৩,০০১ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭,৯৪,৯৫৮' তে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে সিষ্টেম লস্ যেখানে ২৮.৩ শতাংশ ছিল তা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে চলতি বছরের মার্চ,২০০৫ পর্যন্ত ৯.৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গত এপ্রিল ২০০৪ হতে দু'জন সদস্যের নিয়োগ দিয়ে এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের কাজ শুরু করা হয়েছে। এ ছাড়া পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ফেব্রুয়ারী,২০০৫ পর্যন্ত ৪৩,০৭৭ টি গ্রামে ১৮৬৫৮৪ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মানের মাধ্যমে ৫০,১০,৪৬৭ টি আবাসিক, ১,৬০,৬১৬ টি সেচ, ৬,৫৩,৪০২ টি বাণিজ্যিক, ১,০০,৬৫৫ টি শিল্প, ১২,৭৩৮ টি অন্যান্য সংযোগসহ সর্ব মোট ৫৯,৩৭,৮৮৮ টি সংযোগ দিয়েছে।

জ্বালানিঃ- বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও এ দেশে যে উন্নত মানের প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে তা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের ৭০ শতাংশ পূরণ করেছে। দেশের মোট ২২ টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৮.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট রয়েছে। আর উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমান ২০.৫১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। জুন,২০০৪ পর্যন্ত উত্তোলনযোগ্য নিট মজুদের পরিমান ১৪.১৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুটের মধ্যে ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় ৫.৫৪৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট । দেশে বর্তমানে ১৪ টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৫৫টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এ ছাড়া গ্যাস দ্রুত অনুসন্ধান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশকে মোট ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। তাতে আকর্ষণীয় শর্তে প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর আওতায় বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করার ফলে ডিসেম্বর,২০০৫ পর্যন্ত ১২টি ব্লকের জন্য ১০ টি উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২ টি চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ায় বর্তমানে ৮টি চুক্তি বহাল আছে। দেশের যানবাহনে জ্বালানি তেল ব্যবহারের ফলে যে ভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছিল তা রোধ করার জন্য সকল যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ যাবত ৬৯টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এডিবি'র অর্থায়নে '' ঢাকা ক্লিনিং ফুয়েল প্রজেক্ট'' এর আওতায় ২৬ টি ফিলিং স্টেশন স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সরকারি/আধাসরকারি ও স্বায়িত্বশাসিত সংস্থার পেট্রোল চালিত যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ১০,০০০(দশ হাজার) রূপান্তরিত কিট আমদানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ২ টি সিএনজি রূপান্তরের ওয়ার্কশপ একটি সিএনজি মেরামত ওয়ার্কশপ স্থাপন এবং ঢাকা শহরের সিএনজি স্টেশন গুলোতে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত

করার জন্য ১০০ কিমি গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্প সমাপ্ত হলে বাৎসরিক ১ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা হবে। তম্মধ্যে ৭ লক্ষ টন কয়লা বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হবে এবং ৩ লক্ষ টন দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদার জন্য বাজারজাত করা হবে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালানি মজুদ ব্যবস্থার উন্নয়ন/সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন এবং দেশের একমাত্র জ্বালানি তেল শোধনাগার ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর মূল ডিষ্ট্রিলেশন কলাম স্থাপনের কাজ করছে। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী জ্বালানি মজুদ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব গবেষণা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। যার ফলে দিনাজপুর জেলার বড় পুকুরিয়া দিঘিপাড়া এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

বাংলাদেশ সড়ক, রেল ও আকাশপথ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি সমন্বয়ে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং স্থিরমূল্যে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ১০.০১ শতাংশ (সাময়িক)। যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের দিক থেকে অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার তুলনায় সড়ক পরিবহনই সর্বাধিক ব্যবহৃত মাধ্যম। এই সুবিশাল সেক্টরটি গড়ে তোলার দায়িত্ব মূলতঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত বিআরটি এ ইতোমধ্যে সড়ক নিরাপত্তা সেল গঠন করেছে, পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ২ স্ট্রোক থ্রি হুইলার তুলে দিয়ে সিএনজি মোটরযান ব্যবহার উৎসাহিত করছে। এছাড়া যানজট নিরসনে যেমন ফ্লাইওভার নির্মাণ ও উন্নত ট্রাফিক সিগনাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। তেমনি অধিকতর সুষ্ঠু ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্থানে সেতু নির্মাণ করছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি পরিবেশ-বান্ধব, সাশ্রয়ী ও সুলভে মালামাল পরিবহনে সক্ষম একটি নির্ভরশীল মাধ্যম। চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে দেশের বেশির ভাগ নৌ-বাণিজ্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে মংলা সামুদ্রিক বন্দর, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কতৃপক্ষের ভূমিকাও অগ্রগণ্য। সীমিত সম্পদ নিয়ে আন্তর্জাতিক নৌ-পথে দক্ষ শিপিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কাজ করছে। নৌ-পরিবহন ও তার নাবিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর বিভিন্ন বিধি বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করে নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে। দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠা স্থলবন্দরগুলোর দ্রুত অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বিমান চলাচলের অবকাঠামো স্থাপন ও উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দেশে তিনটি আন্তর্জাতিক ও ৫টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি বিমান পরিবহন সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স সরকারের বিভিন্ন সংস্কারমুখী পদক্ষেপের ফলে ক্রমশ লাভজনক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কাজ করছে। বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড দেশের একমাত্র সরকারি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একমাত্র সরকারি ডাক ব্যবস্থা। বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তি খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার এখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মানব উন্নয়ন

সকল উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের জীবন যাত্রার মানের অব্যাহত উন্নয়ন। এ জন্যই জাতিসংঘের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস্ (এমডিজি)-এ মানব কল্যাণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও এমডিজি'কে সামনে রেখে এর আলোকে মধ্যমেয়াদি পিআরএসপি প্রণয়ন এবং এর আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়নের ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য সেবা

এবং সমাজ কল্যাণমূলক কার্যকমকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার Pro-poor growth strategy -অনুসরণ পূর্বক সামাজিক খাতসমূহে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ করছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতসমূহে মোট সরকারি বরাদ্দের প্রায় ২৪ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার অর্জিত সাফল্য টেকসই করে এখাতের আরও উন্নয়নের জন্য প্রথমবারের মত ২০০৩-২০০৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি (HNPSP) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে জোরদার কার্যক্রমের ফলে ইতোমধ্যেই মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব উন্নয়নের মৌলিক উপাদান হিসেবে শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রণীত আইনের আওতায় ১৯৯৩ সন থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। নারী শিক্ষা প্রসারে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। এর ফলে প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর হার প্রায় ৫০ঃ৫০ এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯০ সনের ২১ এর তুলনায় বর্তমানে প্রায় ৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পাবলিক পরীক্ষায় নকল বন্ধ এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সমপানী সনদপত্র এবং নাগরিকতার সনদপত্রে পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম সংযোজন এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপ-বৃত্তির অর্থ উত্তোলনের ক্ষমতা মাতাকে প্রদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের আরও উন্নয়ন ঘটেছে। দেশের যুব সমাজকে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে দেশব্যাপী বেকার যুবকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদানের ব্যাপক কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা ও উপজাতিসহ সমাজের অনগ্রসর বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য প্রচুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অংগনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মান বৃদ্ধির কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে মানব সম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে এবং মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত UNDP'র প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৩ ও ২০০৪ সনে পর-পর দু'বার বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও ভারতের ন্যায় মধ্যম পর্যায়ের দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যৌথ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত দারিদ্র পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪-এর তথ্য মতে প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে (DCI) ১৯৯৯ সালে দারিদ্রের হার ছিল ৪৬.২ শতাংশ যা ২০০৪ সালে হ্রাস পেয়ে ৪০.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই পদ্ধতিতে চরম দারিদ্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯৯ সালে দারিদ্রের হার ছিল ২৪.৯ শতাংশ যা ২০০৪ সালে হ্রাস পেয়ে ১৮.৭ শতাংশে দাঁড়ায়। এই জরিপে বিভাগওয়ারী দারিদ্র পরিস্থিতির ক্ষেত্রে দেখা যায় রাজশাহী বিভাগে দারিদ্রের হার সবচেয়ে বেশী ৬১.৬ শতাংশ এবং সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম ২৮.৪ শতাংশ। পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে দেখা যায় জাতীয় পর্যায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১-২ এর ক্ষেত্রে দারিদ্র প্রবণতা সবচেয়ে কম (২৬.৪ শতাংশ) এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭-৮ এর মধ্যে দারিদ্র প্রবণতা সবচেয়ে বেশী (৪৬.৩ শতাংশ)। মাথাপিছু মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক আয় ছিল ৯৪৮ টাকা এবং তা ২০০৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১১৪ টাকায়। ১৯৯৯-২০০৪ পর্যন্ত সময়ে স্বাস্থ্য সেবায় সার্বিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে অসুস্থ জনসংখ্যা ছিল ১৮.৪ শতাংশ যা দ্রুত হ্রাস পেয়ে ২০০৪ সালে দাঁড়িয়েছে ১৫.৮ শতাংশে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রত্যক্ষ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি, খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি, দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচি, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এবং দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ

বিশেষ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। এ সব কর্মসূচিতে বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতার ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ সুবিধাভোগী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার ক্ষেত্রে ৬ লক্ষ এবং অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার ৬০ হাজার উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্পে ৫৩ লক্ষ অতি দরিদ্র শিশু, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী শিক্ষা সহায়তায় ৪০ লক্ষের বেশী ছাত্রী এবং পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিতে ৪২ হাজার মহিলা উপকৃত হচ্ছে। আবাসন (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রমসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রধান প্রধান নয়টি এনজিও ২০০৪ পর্যন্ত ৩১,৬২৮.৩৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে। মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক, পিকেএসএফ এবং বিআরডিবি যথাক্রমে ২২,৫১৭.৫৯ কোটি, ২০৯১.২২ কোটি এবং ৩১৭০.১১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। তফসিলি ব্যাংকসমূহ একই সময়ে ১১,৪৫১.৫৪ কোটি টাকা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ ১১৫১.০৮ কোটি টাকা বিতরণ করে। সরকারের প্রশাসনিক বিভাগসমূহ কর্তৃক ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ৬০৬৭.০৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

২০০৪-০৫ অর্থ বছরে সাময়িকভাবে প্রাক্কলিত স্থূল দেশজ উৎপাদে যেখানে মোট বিনিয়োগ শতকরা ২৪.৪৩ ভাগ; সেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ শতকরা ১৮.৫৩ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যেখানে মোট বিনিয়োগে ব্যক্তিখাতের অবদান ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ সেখানে বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগের ৭৬ শতাংশ বেসরকারি খাত হতে আসছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাকে দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণে সরকার বদ্ধপরিকর। প্রচলিত উৎপাদন খাত ছাড়াও বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সেবামূলক খাতেও বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণকে সরকার অব্যাহতভাবে উৎসাহিত করছে।

বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন এবং মূলধন বাজার উন্নয়নে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন এ ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখ্যযোগ্য পদক্ষেপ। ১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৬০ (ষাট)টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪০টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২০টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে বেসরকারি প্রকল্প প্রস্তাবনা নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) দাঁড়িয়েছে ২,১৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সিএনজি ব্যবহারের সুবিধার্থে দেশে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত প্রায় ৮৭টি সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন (সরকারিখাতে ৫টি এবং বেসরকারিখাতে ৮২টি) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জুন ২০০৫ পর্যন্ত সিএনজিতে রূপান্তরিত যানবাহনের সংখ্যা প্রায় ২২৭০৬টি। আইসিটি খাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। এপ্রিল'০৫ পর্যন্ত দেশে মোট ৫টি বেসরকারি সেলুলার মোবাইল অপাটের -এর মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৫৪.১৪ লক্ষ। বেসরকারিকরণ নীতির অনুসরণে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি বিমান বন্দরের নন-রেগুলেটরি কাজগুলো বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ফেব্রুয়ারি'০৫ পর্যন্ত মোট ৪৬টি মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেন এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া ১০টি ইন্টারসিটি ট্রেন এর অন বোর্ড পরিসেবা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংক (৩০টি দেশি ও ১০টি বিদেশি) ও বীমা ৬০টি (৪৩টি সাধারণ ও ১৭টি জীবন বীমা) ছাড়াও, বর্তমানে বেসরকারিখাতে ২৮টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকার জাতীয়করণকৃত একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক (রূপালী ব্যাংক)-কে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া বাকি তিনটি জাতীয়করণকৃত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশে রেজিস্ট্রিকৃত ২৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ৭টি ডেন্টাল কলেজ এবং ১৬৫৯৫টি শয্যাসহ ১০৫৫টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ১৩১১টি ক্লিনিক রয়েছে। এর পাশাপাশি বহু উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হার্ট ফাউন্ডেশন, ক্যান্সার হাসপাতাল এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বস্ত্র খাতের সিংহভাগ শিল্প কারখানাই ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা ২২০টি, তন্মধ্যে

বেসরকারিখাতে ১৯৫টি মিল রয়েছে। বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ)'র অধীনে ব্যক্তি মালিকানাধীন বর্তমানে ৪৯টি জুট স্পিনিং মিলস্ রয়েছে। এ সকল মিল মোটা, মাঝারি ও উন্নতমানের জুট ইয়ার্ন ও টোয়াইন উৎপাদন করে থাকে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন

পরিবেশগত সমস্যা এখন একটি অর্থনৈতিক সমস্যা এবং একারণেই অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মকান্ডসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। সরকার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে গণসচেতনতা সৃষ্টিসহ আইনগত বাধ্যবাধকতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পরিবেশ নীতি, জাতীয় পরিবেশ আইন ও বিধিমালা, জাতীয় বন নীতি এবং জাতীয় কৃষি নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে স্বাক্ষরিত কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসচালিত যানবাহনে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার, অক্সিডেশন ক্যাটালিষ্ট ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা; কমপ্রেস পদ্ধতির পরিবেশ-বান্ধব ব্লক ইট প্রচলন উৎসাহিত করা; সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটায় ১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনি স্থাপন বাধ্যতামুলক করা; পাহাড়সমূহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ; শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে পরিবেশ দূষণ সহনীয় মাত্রায় থাকে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবশেগত ছাড়পত্র প্রদান; তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant স্থাপন করার পরই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি, জলবায়ূ পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় কৌশল প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ, ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ওডিএস) এর বাৎসরিক ব্যবহার প্রায় ৬০ শতাংশে হ্রাস, বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য পরিবেশ সম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে পরিবেশ শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি পদক্ষেপ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে। দেশের বনজ সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০ বছর ব্যাপী (১৯৯৫-২০১৫) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০ বৎসর মেয়াদি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। এছাড়া বন বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা, সরকারি পার্ক উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সরাসরি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখছে।